ভীমপলাশির মধ্যম

অভিরূপ সরকার

'পুরোনো বন্ধুরা যত স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে'
অরুণকুমার সরকার

গৌতম বসুর সঙ্গে আমার যখন প্রথম আলাপ হয়, দু'জনেই সবে সতেরো পেরিয়ে আঠেরোয় পা দিয়েছি, ইস্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে দু'জনেই সদ্য কলেজে। একই কলেজ, একই বিষয়, তবু প্রথম পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হতে আরও দু'এক বছর গড়িয়ে গিয়েছিল। কেন, সে প্রসঙ্গে একটু পরেই আসব, তার আগে বলে রাখি, এসব অনেকদিনের কথা। এখন ভাবলে মনে হয় যেন এই জন্মের আগে আর একটা জন্ম ছিল।

১৯৭২ সালের কথা বলছি। কলকাতার রাস্তায় তখনও মাঝে মাঝে বোমা পড়ে, পুলিশের কালো ভ্যান টহল দেয় ফাঁকা রাজপথে, যদিও শহরের দেয়ালে টুপি পরা চিনের চেয়ারম্যানের স্টেনসিল কাটা প্রতিকৃতি রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে ক্রমশ মলিন হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সেই মলিন ছবির ওপর এশিয়ার মুক্তিসূর্য-র ছবি গজিয়ে উঠল। তার জেরে প্রায় রোজই দেখতাম কলেজ পোর্টিকোতে কাজিয়া লেগে আছে। কাজিয়া অবশ্য এক তরফা। রোজ একই চিত্র। এশিয়ার মুক্তিসূর্যের দল বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে চিনের চেয়ারম্যানের দলকে ঠেঙাচ্ছে। ঠিক যেমন করে কয়েক বছর আগে চিনের চেয়ারম্যানওলারা বন্দেমাতরমদের ঠেঙাত।

গৌতম বা আমার মতো কলেজের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই অবশ্য মারামারির মধ্যে থাকত না, তবে অনেকেই মনে মনে কোনো একটা দলকে সমর্থন করত। নীরব কিংবা উচ্চকিত। আমার বিশ্বাস, গৌতমের নীরব সমর্থন ছিল বামেদের দিকে। আর আমি, পারিবারিক সূত্রেই সম্ভবত, ঘোর অবাম। এতটাই যে, কলেজের প্রথম বছর বামেদের বিরুদ্ধে ইলেকশনেও দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। হয়তো এই কারণে প্রথম কিছুদিন গৌতমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা তেমন জমেনি।

আরও একটা কারণ ছিল। গৌতম এসেছিল একেবারে খানদানি সাহেবি ইস্কুল থেকে। আমি যে ইস্কুল থেকে গিয়েছিলাম সেখানে ছোটো থেকে ইংরেজি পড়ানো হলেও, সাহেবি আদব কায়দা, এমনকি সাহেবি ডিসিপ্লিনেরও বালাই ছিল না।

ইংরেজিতে কথাবার্তা বলারও তেমন সুযোগ ঘটত না। তাই ইস্কুল থেকে বেরিয়ে, আমি অন্তত, গড়গড় করে ইংরেজি বলতে পারতাম না। তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজে সাহেব-বাঙালি একটা স্পষ্ট ভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুটা আলাদা করে রাখত। সাহেবি ইস্কুল থেকে যারা যেত, তারা গড়গড় করে ইংরেজি বলে বাড়তি খাতির পেত। সেই কারণে গৌতমকে আমি সমীহ করতাম, হয়তো একটু দূরেরও ভাবতাম। তখনও গৌতমের বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। গেলে জানতে পারতাম গৌতমের বাড়িটা আমাদের বাড়ির মতই ষোলো আনা বাঙালি।

আমরা যখন দ্বিতীয় বছরে তখন কলেজ ম্যাগাজিন বেরোচ্ছে। সেখানে গৌতমের একটা ইংরেজি লেখা, শিরোনাম 'ব্ল্যাক অর্ফিউস', সকলের নজর কাড়ল। কৃষ্ণাঙ্গ কবিদের নিয়ে প্রবন্ধ, যত দূর মনে পড়ছে, কিছু কবি মার্কিনি, কিছু আফ্রিকা মহাদেশের। আমিও একটা লেখা জমা দিয়েছিলাম, ইংরেজ কবি উইলিয়াম ব্লেকের ওপর ইংরেজিতে লেখা একটা রচনা, লেখাটা মনোনীত হয়নি। হবার কথাও নয়। একে আমার ইংরেজি অত্যন্ত কাঁচা, তার ওপর বিষয়টার ওপরেও আমার তেমন দখল নেই, শুধু ব্লেকের কবিতার প্রতি অর্গলহীন ভালবাসা এবং অর্থহীন উচ্ছ্বাস আছে। লেখাটা ছাপা হয়নি বলে এখন মনে মনে পত্রিকা সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু তখন সেরকম মনে হয়নি। বরং ভাবতাম, স্বপন এবং গৌতম একই ইস্কুল থেকে এসেছে বলেই লেখাটা ছাপা হল, না হলে কী আর হত? এ-নিয়ে কিছু বাষ্প কিছুদিন হৃদয়ে জমা হয়েছিল।

সেই প্রথম যৌবনে পাঠ্য বিষয় অর্থনীতির তুলনায় সাহিত্যেই আমার উৎসাহ ছিল বেশি। একদিন জানতে পারলাম, গৌতমেরও সাহিত্যে খুব উৎসাহ, বিশেষ করে কবিতায়। ক্লাসের পরে ওকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কবিতা পড়তে তোর ভালো লাগে?' ও বলল, 'এখন আর এস টমাস-এর কবিতা পড়ছি। খুব ভালো লাগছে।' নামটা আগে শুনিনি। তাও বিজ্ঞের মতো ঘাড় নাড়লাম। বললাম, 'আর কার কবিতা পড়ছিস?' ভাবলাম, এবার নিশ্চয় চেনা দু'একটা নাম শুনতে পাব। ও বলল, 'ওসিপ মান্দেলস্তাম, আনা আখমাতোভা।' হায় কপাল, এঁদের নামও তো আগে কখনো শুনিনি, কবিতার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দূরের কথা। আমি বললাম, 'আর এলিয়ট, ইয়েটস, ডিলান টমাস?' গৌতম বলল, 'দ্বিতীয় এবং তৃতীয়জন খুবই বড়ো কবি, কিন্তু এলিয়টের কবিতা আমার ভালো লাগে না'। এলিয়টের কবিতা ভালো লাগে না! আমি তো অবাক। গৌতমের সঙ্গে একটা ছোটোখাটো তর্ক বেঁধে গেল। সেই প্রথম সাহিত্য নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বললাম, দীর্ঘ দিন ধরে ওর কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ শিখেছি, সেই তার শুরু। এই শেখার ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে খাঁটি। বন্ধুর স্মৃতি-তর্পণ করার জন্যে বাড়িয়ে বলছি, এমন নয়। শেখাটা এই কারণে যে, গৌতম যেমন সাহিত্য নিয়ে একেবারে নতুন করে ভাবতে পারত, আমার সে রকম ক্ষমতা ছিল না।

পেঙ্গুইন থেকে তখন 'পেঙ্গুইন পোয়েটস' নাম দিয়ে একটা সিরিজ বেরোয়। এক-একটা বইতে, যাঁরা ইংরেজিতে লেখেন এমন, দু'জন বা তিনজন করে কবির কবিতা। এই সিরিজের প্রথম বই, পেঙ্গুইন পোয়েটস-১ বেরিয়েছিল ১৯৭০ সালে। তাতে ছিলেন লরেন্স ডারেল, এলিজাবেথ জেনিংস এবং আর এস টমাস। দেখলাম, বইটা কলেজ স্ট্রিটে রূপা কম্পানির বই-এর দোকানে বিক্রি হচ্ছে। দাম, যতদূর মনে পড়ছে, পঁয়ত্রিশ নতুন পেন্স। তখন নতুন পেন্স কথাটা চলত।

টাকা-আনা-পাইএর বদলে আমাদের দেশে যেমন এক সময় দশমিক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, যে কারণে আমার ছোটোবেলায় নতুন চালু হওয়া পয়সাকে বলা হতো নয়া পয়সা, তেমনি বিলেতেও সাবেকি পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সকে সরিয়ে জায়গা করে নিয়েছিল পাউন্ড ও নতুন পেন্স। একশ নয়া পয়সায় এক টাকার মতো একশ নতুন পেন্সে এক পাউন্ড। তারপর এক সময় পেন্স এবং পয়সার সামনে থেকে নতুন শব্দটা উঠে গেল। সে যাই হোক, যে সময়ের কথা বলছি টাকার দাম তখন রোজ রোজ বদলাতো না। তখন এক পাউন্ডের দাম ছিল কুড়ি-একুশ টাকা এবং সেই হিসেবে বইটার দাম হল সাড়ে সাত টাকার মতো। হাতখরচ কিংবা টিউশানির টাকা বাঁচিয়ে কিনে ফেলা যায়। গৌতমের কথায় বইটা কিনেও ফেললাম।

'পেঙ্গুইন মডার্ন ইউরোপিয়ান পোয়েটস' বলে আর একটা সিরিজ বেরোত। একটা বইতে একজন কবি রিলকে, অ্যাপোলোনেয়ার, গুন্টার গ্রাস, চেসারে পাভেস, ভ্লাদিমির হোলান— সেখানে আখমাতোভাও ছিলেন। কয়েক মাস পরে আখমাতোভার বইটাও কিনে ফেললাম। মান্দেলস্তামের বই হাতে এসেছিল আরও অনেকদিন পরে।

সে এক আশ্চর্য সময়। হাতের কাছে যা পাচ্ছি গোগ্রাসে গিলছি। বিভূতি-মানিক-তারাশঙ্কর-সতীনাথের পাশে শিবরাম চক্রবর্তী, অবনীন্দ্রনাথ। গুরুগম্ভীর রাশিয়ান উপন্যাসের সঙ্গে আগাথা ক্রিস্টি, ওডহাউস। ইয়োরোপীয় কবিতার পাশাপাশি তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের বাংলা কবিতা। আর সবার ওপরে মহীরুহের মতো রবীন্দ্রনাথ। একই সঙ্গে গান শোনা চলছে আবদুল করিম, ফৈয়াজ খান; আমীর খান, আলি আকবর। একবার ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিকের বদান্যতায় নামমাত্র মূল্যে সারা বছর ধরে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীত শুনলাম। দেশ-বিদেশের বহু শিল্পী কলকাতায় এসে তাঁদের সঙ্গীত শোনালেন। ওই রকম একটা কনসার্টে বিরতির সময় বাইরে সিগারেট খেতে এসে দেখি লম্বা লম্বা সাহেব-মেমদের মাঝে একটা মাথা সবার ওপরে জেগে আছে— সত্যজিৎ রায়। আর একবার ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে নিউ শেক্সপিয়র কম্পানি কলামন্দিরে টম স্টপার্ডের 'রোসেনক্রানৎস অ্যান্ড গিল্ডেনস্টার্ন' নাটকটা মঞ্চস্থ করল। হ্যামলেটের দু'টি পার্শ্বচরিত্র নিয়ে নাটক, মাত্র দুজন অভিনেতা, বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'র কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এইসব পড়ছি, শুনছি, দেখছি আর এক-একটা নতুন রাস্তা খুলে যাচ্ছে। নতুন রাস্তায় একা হাঁটা যায় না, সহযাত্রী লাগে। গৌতম আমার সেই ভ্রমণের প্রধানতম সহযাত্রী।

আমাদের সঙ্গে পড়ত ভাস্বর মৈত্র, পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন যাদবপুরে অধ্যাপনা করেছে, গত বছর সেও চলে গেল। ভাস্বর আর গৌতম মিলে একটা ইংরেজি কবিতা পত্রিকা বার করল ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে। পত্রিকার নাম ইয়োথেন, যার অভিধানগত অর্থ 'ফ্রম দ্য ইস্ট'। পত্রিকার দুটো অংশ, একটা অংশে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লেখা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ, অন্য অংশে ইংরেজিতে লেখা মৌলিক কবিতা। ইয়োথেন-এর জন্য আর এস টমাস একটা কবিতা পাঠিয়েছিলেন।

ওই পত্রিকায় গৌতম বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতা অনুবাদ করেছিল। অনুবাদটা ছাপানোর জন্যে কবির অনুমতি দরকার। তাছাড়া অনুবাদটা একবার কবিকে দেখিয়েও নিতে হবে। আমি গৌতম এবং ভাস্বরকে নিয়ে বীরেনকাকার বাড়ি গেলাম। বাবার বন্ধু হিসেবে আমি তাঁকে কাকা বলতাম। বীরেনকাকা তাঁর ঢাকাই উচ্চারণে বললেন, 'আমি অত ইংরাজি-টিংরাজি বুঝি না। ওটা অরুণরে দ্যাখাইয়া লও।' অরুণ মানে অরুণকুমার সরকার, আমার বাবা। প্রথম সংখ্যা বেরোনোর পরই ইয়োথেন-এর অকালমৃত্যু হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গৌতমের ইংরেজিতে সাহিত্য চর্চারও অবসান ঘটে।

১৯৭৬ সালে এম এ ক্লাসে ভর্তি হবার পর গৌতমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এম এ ক্লাস হতো বি টি রোডে, সিঁথির কাছে, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে, এখনও তাই হয়। এক সময় ওই অঞ্চলে এভেরি কম্পানির একটা কারখানা ছিল যেখানে কাঁটা দেওয়া ওজন যন্ত্র তৈরি হতো। সেই থেকে জায়গাটার নাম কাঁটাকল। আমরা যখন কাঁটাকলে পড়তে গেলাম তখনও রবীন্দ্র ভারতীর মূল ক্যাম্পাসটা বি টি রোডে উঠে আসেনি। তার জায়গায় ছিল ঝিল-টিল সমেত একটা মস্ত বাগানবাড়ি, নাম এমারেল্ড বাওয়ার। বাড়িটা পুরোনো, ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনও এক সময় পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির হরকুমার ঠাকুর বানিয়েছিলেন। বাড়ির ভেতরে ঢোকার উপায় নেই, তবে বাইরে ঝিলের ধারে বসে সারাদিন আড্ডা মারলেও কেউ আটকাবে না। ওখানে গৌতমের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিয়েছি, কখনও দুটো ক্লাসের ফাঁকে, কখনও বা ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পর। কখনও কখনও অন্য বন্ধুরাও থাকত, কখনও শুধু গৌতম আর আমি। আড্ডায় ঘুরে ফিরে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের প্রসঙ্গ এসেই পড়ত, তবে যেহেতু আড্ডা তাই খেলাধুলো, সিনেমা, অর্থনীতি, রাজনীতি কিছুই বাদ যেত না।

সেই সময় গৌতম আর আমি খুব সিনেমা দেখতাম। প্রায় সবই হলিউড। চোখের সামনে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের কাছে যমুনা বলে একটা সিনেমা হল তৈরি হলো আর তার পাশে, আবিষ্কার করলাম, লি-জনসন রেস্টরেন্ট বলে একটা অ্যাংলো-চাইনিজ ভোজনালয় রয়েছে। মেট্রো-লাইটহাউস-গ্লোব-টাইগার-এলিট-মিনার্ভা কিংবা সদ্যনির্মিত যমুনায় সিনেমা দেখে বা দেখার আগে লি-জনসন রেস্টোরেন্টে খাওয়া, এই ছিল আমাদের ধারণায় বিলাসিতার উচ্চতম স্তর। একটাই সমস্যা

বিলাসিতা করার জন্যে পকেটে যে রেস্তটা দরকার তার মাঝে মাঝেই অভাব ঘটত। ফলে লি-জনসন ভোজনালয়ে আমাদের খাদ্য তালিকায় একটাই মাত্র আইটেম থাকত— মিট চাউমিন।

আড়াই টাকা প্লেট। মিট চাউমিনের থেকে কম দামের কিছু ওখানে পাওয়া যেত না। তার দরকারও পড়ত না অবশ্য। আড়াই টাকা খরচা করে ওই খাদ্য খেলে পেটটা একেবারে ভরে যেত, মনটাও। সত্যি বলতে কি, ওই মিট চাউমিনের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। লি-জনসন অত্যন্ত সৎ প্রতিষ্ঠান, কী জাতীয় মিট দিয়ে চাউমিনটা বানানো হচ্ছে সেটা নিয়ে কোনো মিথ্যে তারা বলত না। ঘোষণা মোতাবেক, চাউমিনে মিট অবশ্যই একটা থাকত। এবং সেই মিট চিকেন বা পোর্ক নয়, এটাও নিশ্চিত। কারণ চিকেন চাউমিন এবং পোর্ক চাউমিন নামে দুটি পদ আলাদা করে পাওয়া যেত। তা হলে কীসের মিট? আমার বিশ্বাস, কখনও কুকুর, কখনও বেড়াল, কখনও ইঁদুর মানে, যেদিন যেটা পাওয়া যায় তাই দিয়ে ওই সুখাদ্য তৈরি হত। রেস্টোরেন্ট কর্তৃপক্ষও আগে থেকে বলতে পারত না কোন দিন কোনটা পাওয়া যাবে।

কাউন্টারের ওপাশে যে পীতবর্ণ, বিপুলায়তন ভদ্রলোক বসে থাকতেন, তিনি লি সাহেব না জনসন সাহেব নাকি তাঁদের কোনও প্রতিনিধি সেটাই কখনও সাহস করে যাচাই করা হয়নি। অতএব মিট চাউমিনের মিটটা কোন প্রাণীর মাংস সেটা জিজ্ঞেস করার প্রশ্নই ওঠে না। গৌতম যখন প্রথম চাকরি পেল, আমি তখন বিদেশে। চিঠিতে লিখলুম, চাকরি পেলি, খাওয়ালি না? পরের চিঠিতে গৌতম একটা ছবি এঁকে পাঠাল— গৌতম আর আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, পিছনে লি-জনসন রেস্টোরেন্ট। ছবিটা মন্দ আঁকেনি।

'নাইট ওয়াচ' বলে লাইটহাউসে একটা সিনেমা হচ্ছে, বেশি বয়েসের এলিজাবেথ টেলর, আরও কারা সব যেন আছে, দুরন্ত সাসপেন্স। গৌতম তখন দাড়ি রাখত। সিনেমা দেখতে দেখতে টেনশানে একটা একটা করে দাড়ি উপড়োচ্ছে। সিনেমা শেষ হবার পর দেখলাম ওর নীল রঙের কোটটা দাড়িতে ভরে গেছে।

কিন্তু আমাদের গল্পটা সিনেমা দেখার আগে থেকে শুরু। লাইটহাউসে 'নাইট ওয়াচ' দেখতে এসে দেখি বেশ ভিড়। একেবারে ওপর দিকের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। দু'জনের কাছে যা ছিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে দু'টো টিকিট কাটা গেল। হাতে ঘন্টা খানেক সময় আছে। পেটে প্রচণ্ড খিদে। পকেটে পয়সা থাকলে কিছু খেয়ে আসা যেত। কিন্তু টিকিট কাটার পর দু'জনের কাছে বাসভাড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। তবে সিগারেটের প্যাকেটে কিছু চারমিনার অবশিষ্ট আছে, এটুকুই যা ভরসা। কী করা যায়? হঠাৎ গৌতম ওর নীল রঙের কোটের কোনও গোপন পকেট থেকে যাদুকরের মতো একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে ফেলল। কবে রেখেছিল ওর নিজেরই মনে নেই। অতএব সিনেমা দেখার আগে লি-জনসন। মিট চাউমিন। এত নির্মল আনন্দ জীবনে খুব কম পেয়েছি।

ঠিক কোন বছর মনে নেই, সম্ভবত এমার্জেন্সির আশেপাশে কোনও একটা সময়ে, হলিউড থেকে সিনেমা আসা কিছুদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। কারণটা জানা নেই, শুধু দেখলাম সাহেব পাড়ায় অ্যামেরিকান কিংবা ব্রিটিশ ছবির বদলে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে সিনেমা আসছে। রাশিয়ান ছবি সাধারণভাবে হলিউডের বিকল্প হতেই পারে না, তাই নিয়ে তখন আমাদের ক্ষোভেরও শেষ ছিল না, কিন্তু সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিল কজিন্সটেভের রাশিয়ান হ্যামলেট এবং কিং লিয়ার। ছবি দু'টো দেখে কলকাতা শহর একেবারে ধরাশায়ী। হ্যামলেট আমাকে যেমন নাড়া দিয়েছিল তেমনি কিং লিয়ার গৌতমকে। আর একটা ছবি জ্যোতি সিনেমায় গৌতমের সঙ্গে দেখেছিলাম, ছবির নাম দেরসু উজালা, পরিচালক আকিরা কুরুসোওয়া। জাপান এবং রাশিয়ার যৌথ প্রযোজনা, কুরুসোওয়ার পরিচালনা হলেও ছবিটা রুশ ভাষায়। এমন ভাল ছবি খুব বেশি দেখিনি, বারবার আরণ্যকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। এখন ভাবি, হলিউডের ছবি আসা বন্ধ না হলে ওই অসাধারণ ছবিগুলো দেখাই হত না।

আর ছিল মোহনবাগান। গৌতম আর আমি দু'জনেই তার অন্ধ ভক্ত। দুঃখ এই যে, আমাদের কলেজ জীবনে মোহনবাগান প্রায় জিততই না। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫, অর্থাৎ আমাদের ক্লাশ টেন থেকে থার্ড ইয়ার, টানা ছ'বছর ইস্টবেঙ্গলের লিগ দখল তো ঐতিহাসিক ঘটনা। অতএব আমরা মরমে মরে থাকতাম। তারপর ১৯৭৬-এ মোহনবাগানের হয়ে ইস্টবেঙ্গলকে প্রথম মিনিটে দেওয়া আকবরের গোল, সেটাও কম ঐতিহাসিক নয়। গৌতম আর আমি কফি হাউসে ছিলাম। গৌতম বলল, একটা সেলিব্রেশন দরকার। ওর একটা মেরুন রুমাল ছিল। সবুজের অভাবে টেবিলে বসে সেটাই ওড়ানো হলো।

তিন বছর পরে, শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগান যখন ১-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারাল, আমি তখন বিদেশে। চিঠিতে খবরটা দিয়ে গৌতম আমাকে লিখল, ৫-০-র বদলাটা আমরা নিতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছে করেই নিলাম না। কারণ প্রথমত, ১-০ একটা সুচারু ব্যবধান। এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের দয়ার শরীর।

গৌতমের কথা ভাবলে অসংখ্য গল্প, ঘটনা, মুহূর্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একদিন কাঁটাকলে পৌঁছে দেখি হঠাৎ ছুটি হয়ে গেছে। গৌতম আর আমি এল-২০ বাসে চড়ে সোজা ব্যারাকপুর। হাঁটতে হাঁটতে একটা ভাঙা চার্চে পৌঁছলাম। তার চত্বরে বসে সারাদুপুর আড্ডা। একটা অজানা দোকানে চা-বিস্কুট খেয়ে আবার কলকাতা।

আমাদের রাসবিহারী এভিনিউ-এর বাড়ির ছাদে সতরঞ্চি পেতে গানের আসর বসেছে। আমাদের সহপাঠী অশোক কয়েকটা টপ্পা অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার পর, আমাদের আর এক সহপাঠী পরন্তপ, সুগত মার্জিতের সঙ্গে যুগলবন্দীতে, ভীমপলাশি গাইল। সুগত আমাদের থেকে তিন বছরের ছোটো, তখন সদ্য কলেজে ঢুকেছে। গৌতম, ভাস্বর, সত্যজিৎ আর আমি নিমগ্ন শ্রোতা। ভীমপলাশির সঙ্গে সেই প্রথম প্রেম

যার ঘোর এখনও কাটেনি। অন্য একটা দুপুরে গৌতম আর আমি আলি আকবরের ভীমপলাশি শুনছি। খাদের কোমল নিষাদ থেকে ষড়জ, কোমল গান্ধার মধ্যম হয়ে পঞ্চমে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার বদলে আলি আকবর খাঁ সাহেব হঠাৎ মধ্যমে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর অমনি চরাচরব্যাপী একটা অন্তহীন হাহাকার সূচিত হল। অমন হাহাকার আর একমাত্র বিসমিল্লার ভীমপলাশিতে শুনেছি। গৌতম বিসমিল্লার একটা মস্ত ছবি দেয়ালে টাঙিয়ে রাখত।

আর একটা দিন। আমাদের বন্ধু সত্যজিৎ, একটু আগেই যার কথা লিখলাম, গৌতমকে আর আমাকে নিয়ে শিবরাম চক্রবর্তীর কাছে গেছে। শিবরামের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। পারিবারিক সূত্রে সত্যজিৎ শিবরাম চক্রবর্তীকে আগে থেকেই চিনত। সেই মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মেস, সেই ঘর, দেয়াল ভর্তি ঠিকানা লেখা, শিবরামের সেই বিখ্যাত তক্তোপোষ। রোমাঞ্চের আর বাকি কী রইল! তবে আশ্চর্য ব্যাপার, ধরে নিয়েছিলাম শিবরাম চক্রবর্তী একজন মজার মানুষ হবেন, মজার মজার কথা বলবেন। তার বদলে দেখলাম এক গভীর এবং গম্ভীর শিবরাম চক্রবর্তীকে। অটোগ্রাফ চাইলাম। বললাম, আপনার গল্পে হর্ষবর্ধন বলছেন, আটটা ফটোগ্রাফে একটা অটোগ্রাফ হয়। আমাদের আটটা ফটো চাই না, একটা সই দিলেই হবে। উনি বললেন, এক সময় স্টুডিয়োতে গেলে একসঙ্গে আটটা ছবি তুলে দিত। বলত অটোগ্রাফ। মনে হয় আমার গল্পটা সেই সময়ে লেখা। বলে আমার গ্রোথ থিয়রির নোটখাতার শেষ পাতায় সই করে দিলেন। খাতাটা বহুদিন যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। এখন বোধহয় হারিয়ে গেছে। ফেরার আগে শিবরামকে প্রণাম করতে গেলাম। উনি বাধা দিয়ে বললেন, মা-বাবা ছাড়া কোনোদিন কাউকে প্রণাম কোরো না। আর কেউ প্রণামের যোগ্যই নয়।

শিবরাম চক্রবর্তীর মেস থেকে বেরিয়ে আবার কফি হাউস। রাত অব্দি আড্ডা। আমরা তখন রিলকের ডুইনো এলিজিস পড়ছিলাম।

গৌতম আর আমি বকখালি বেড়াতে গেছি। সেই সময় বকখালি যাবার কোনও সরাসরি বাস ছিল না। একটা বাসে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার, তারপর আর একটা বাসে ডায়মন্ডহারবার থেকে কাকদ্বীপ, তারপর আবার একটা বাসে কাকদ্বীপ থেকে নামখানা। নামখানায় নেমে স্টিমারে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী পার হতে হত। ওপারে গিয়ে আবার একটা বাসে ফ্রেজারগঞ্জ। শেষে ফ্রেজারগঞ্জ থেকে আধঘন্টা পায়ে হেঁটে বকখালি। বকখালিতে একটা চমৎকার সরকারি পান্থশালা ছিল, সম্ভবত এখনও আছে। সেখানে দু'রাত্তির কাটালাম। আমরা তখন গ্রিক কবি ইয়ানিস রিটসসের কবিতা খুব পড়ছি।

আমার প্রথম চাকরি ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়, ১৯৭৮ সালে। এলাহাবাদে পোস্টিং। গৌতমের লেখা নীল ইনল্যান্ডের জন্যে সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকতাম। টিপিনের

সময় তারিয়ে তারিয়ে পড়তাম গৌতমের সুস্বাদু চিঠি। একটা চিঠিতে গৌতম জানাল কমলকুমার মজুমদার আর নেই। লিখল, কমলকুমারের যে ছবিটা আনন্দবাজারে বেরিয়েছে সেটা মনে হয় ওঁর খুব অল্প বয়েসের। প্রায় কুস্তিগীরের মতো দেখাচ্ছে।

বিদেশ থেকে আমি হঠাৎ ফিরে এসেছিলাম। পাকা চাকরি একটা ছিল সেখানে, কিন্তু থাকতে মোটে ভালো লাগত না। ভিসা নিয়ে একটা সামান্য গণ্ডগোল হয়েছিল, একটা উকিলের কাছে গেলেই সেটা মিটিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু সে পথে না গিয়ে, ভিসার গণ্ডগোলটাকে ছুতো করে হঠাৎ ফিরে এলাম। যেদিন ফিরলাম, এসে শুনি, সেদিনই গৌতমের বিয়ে। কিচ্ছু জানায়নি আমাকে। বিবাহবাসর আমার বাড়ির খুব কাছে। সেই রাত্তিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না, পরের দিন সকালে আমি বাসরে গিয়ে হাজির। গৌতম আমাকে দেখে চমকে উঠল। বলল, খবর দিসনি তো দেশে আসছিস। আমি বললাম, আসছি কি? একেবারে ফিরে এসেছি। তুইও তো খবর দিসনি বিয়ে করছিস। ও বলল, তোকে একটা সারপ্রাইজ দেব ভেবেছিলাম। আমি বললাম, আমিও তাই ভেবেছিলাম। দু'জনেই যথেষ্ট সারপ্রাইজ্‌ড্‌ হবার ফলে শোধ-বোধ হয়ে গেল।

এর মাসখানেক পরে একটা পড়ন্ত বিকেলবেলা শ্যামবাজার থেকে বাস ধরে সোজা টাকী চলে গেছি। গৌতম তখন ওখানে পোস্টেড। গৌতমের ব্যাঙ্ক থেকে কিছুটা হাঁটলেই ইছামতি নদী। ইছামতির ধারে বসে চা-সিগারেট খাওয়া হল, অনেক গল্প হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কবিতা লিখিস বউ জানে? ও বলল, এখনও জানে না, তবে শিগগির জেনে যাবে মনে হয়। এসব রোগ বেশি দিন লুকিয়ে রাখা যায় না।

গৌতমের গল্প একবার শুরু হলে শেষ হতে চায় না। কিন্তু কোথাও তো একটা দাঁড়ি টানতে হবে। গৌতমের কবিতা নিয়ে এখানে বিশদ করে কিছু লিখলাম না। হয়তো অন্য কোথাও সুযোগ ঘটবে। শেষ করার আগে শুধু এইটুকু বলব, গৌতম সারা জীবন মানুষের দুঃখকষ্ট এবং দুঃখকষ্ট পেরিয়ে যে আনন্দ তাই নিয়ে লেখার চেষ্টা করেছে। কৈশোর-যৌবনে তিনটে বই ওকে আপাদমস্তক প্রভাবিত করেছিল— ডিকেন্সের ক্রিসমাস ক্যারল, ডস্টয়ভস্কির ব্রাদারস কারামাজোভ এবং ভিক্টর হুগোর লে মিসেরাবল্‌স্‌। একটু ভেবে দেখলে তিনটে উপন্যাসের মধ্যে একটা সামান্যলক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে, যাকে বলা যায় suffering and deliverance। সাহেবদের কাছে দুঃখকষ্টটা উত্তরণের প্রধানতম শর্ত। গৌতমের কাছেও কি তাই ছিল না? নয়নবারির অপরিসীম শক্তিতে গৌতমও কি বিশ্বাস করত না?

জীবন গৌতমের প্রতি সর্বদা প্রসন্ন হয়নি। তবু প্রবল দৈবী অবিচারের বিষ শরীরে শুষে নিয়ে সে যে কবিতা রচনা করেছে, তাতে কোথাও কোনো গ্লানি নেই, মালিন্য নেই, কেবল অপার স্নিগ্ধতা আছে, প্রসন্নতা আছে। এই কৃতিত্ব সামান্য নয়।